প্রয়োজন
ব্যবস্থা, কীটনাশক ঔষধের ব্যবস্থা, উপযুক্ত
সীমা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তবেই এর উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

■ ৬.২. ভারতের চাষ ব্যবস্থার সংগঠন (Organisation of Farming in India)

চাষ ব্যবস্থার সংগঠন কার্যকরী জোতের আয়তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে পরিমাণ জমি কৃষি উৎপাদনের একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাকে কার্যকরী জোত বলে। কার্যকরী জোতের আয়তনের উপর ভিত্তি করে কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের খামারের (farm) অস্তিত্ব দেখা যায়। কৃষি অর্থনীতিতে মূলত তিন ধরনের খামারের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে ঃ

(ক) ভরণপোষণের খামার ঃ পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনসহ ভরণপোষণের জন্য যখন কৃষিকাজ পরিচালিত হয়, তখন তাকে ভরণপোষণভিত্তিক খামার বলে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কৃষিকাজ পারিবারিক শ্রমের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। এই ধরনের কৃষিকাজ উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না।

(খ) অর্থনৈতিক খামার ঃ যে খামারে এমন পরিমাণ শস্য উৎপাদন হয় যা থেকে উৎপাদন ব্যয় মিটিয়ে জমির মালিক তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণ সহজেই চালাতে পারে, সেই খামারকে অর্থনৈতিক খামার বলে। এই সমস্ত খামারের মালিকদের মাঝারি চাষী বলা যায়। অধ্যাপক ম্যান-এর মতে অর্থনৈতিক খামার হল সেই খামার, যে খামার গড় আয়তনের কৃষক পরিবারকে এক সন্তোষজনক জীবনযাপন করতে সাহায্য করে।

(গ) কাম্য আয়তনের খামার ঃ কৃষি উৎপাদনে যে সমস্ত উপাদান নিয়োগ করা হয় সেই সমস্ত উপাদানকে সর্বাধিক দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য যে আয়তনের খামার হওয়ার প্রয়োজন, তাকে কাম্য আয়তনের খামার বলে। এই ধরনের খামারে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন।

ভারতের চাষ ব্যবস্থা মূলত পারিবারিক ভিত্তিতেই সংগঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে তিন ধরনের চাষ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

(i) মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাষ ব্যবস্থা।

(ii) প্রজাস্বত্ব চাষ ব্যবস্থা।

(iii) সমবায় চাষ ব্যবস্থা।

● ৬.২.১. মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাষ ব্যবস্থা (System of Peasant Proprietorship) ঃ

জমির মালিক নিজের উদ্যোগে কৃষিকাজ সম্পাদিত করলে সেই চাষ ব্যবস্থাকে মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাষ ব্যবস্থা বা বেসরকারি মালিকানাধীন চাষ ব্যবস্থা বা বেসরকারি মালিকানাধীন খামার বলে। এই ধরনের চাষ ব্যবস্থা জমির মালিক নিজের পরিবারের শ্রমের সাহায্যে চাষ করতে পারে। আবার বাজার থেকে শ্রমিক ভাড়া করে চুক্তি অনুযায়ী চাষ করতে পারে।

মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাষ ব্যবস্থায় উন্নত যন্ত্রপাতি, উন্নত ধরনের বীজ, জলসেচের সুযোগ-সুবিধা অর্জনের জন্য জোতের আয়তন বড় হলে তাকে **ধনতান্ত্রিক খামার** (Capitalist Farming) বলে।

ভারতে মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের যে চাষ ব্যবস্থা চালু আছে তা মূলত পরিবারভিত্তিক। পরিবারের সদস্যরা একত্রে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করে। পরিবারভিত্তিক চাষ ব্যবস্থায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম। ভারতে পরিবারভিত্তিক চাষ ব্যবস্থায় আবার পরিবারের সদস্য ছাড়াও ভাড়া করা শ্রমিকের সাহায্যে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্পসেট ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিকাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে চাষযোগ্য জমির

Scanned with CamScanner

পরিমাণ কিন্তু বেশি। তাই ভারতে এগুলি বৃহৎ জোত হিসাবে গণ্য করা হয়। এই ধরনের চাষ ব্যবস্থাকে অনেকে ধনতান্ত্রিক চাষ ব্যবস্থা (Capitalistic farming) বলে অভিহিত করেন। ভারতে যেগুলিকে বৃহত্তম জোত হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলি আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের জোতের আয়তনের তুলনায় খুবই ছোট।

পরিকল্পনাকালে ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি হল মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের ছোট জোতভিত্তিক চাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন। সেই জন্যই ছোট জোত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভূমিসংস্কার আইনে জোতের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের কথা বলা হয়েছে।

● ৬.২.২. **প্রজাস্বত্ব চাষ ব্যবস্থা (System of Tenant Farming) :** জমির মালিক নিজে জমি চাষ না করে জমি চাষ করার স্বত্ব অপরকে দিয়ে জমি চাষ করালে তাকে প্রজাস্বত্ব চাষ ব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ জমি ইজারা দিয়ে চাষ ব্যবস্থাকেই বলা হয় প্রজাস্বত্ব চাষ ব্যবস্থা। আঞ্চলিক নিয়মকানুন, প্রথা ও অর্থ-সামাজিক বিভিন্ন রীতি অনুসারে বিভিন্ন শর্তে জমির মালিক কৃষককে জমি চাষের যে অধিকার দেয়, তাকে ইজারা বলে। জমির মালিকের কাছ থেকে যে কৃষক জমি ইজারা নেয়, তাকে প্রজা বলা হয়। কারণ জমির মালিকের সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব কৃষক মেনে নেয় জমি চাষ করার অধিকারের বিনিময়ে।

প্রজাস্বত্ব চাষ ব্যবস্থায় জমির মালিক যখন তার জমি চাষ করার স্বত্ব অপরকে দেয় তার বিনিময়ে জমির মালিক খাজনা পেয়ে থাকে। জমির খাজনা অর্থের মাধ্যমে সংগ্রহ হতে পারে, আবার উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমেও সংগ্রহ হতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থাকে ভাগচাষ ব্যবস্থাও বলা যায়।

উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হল উৎপাদন যাই হোক না কেন, বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল খাজনা হিসাবে জমির মালিককে দিতে হবে। যেমন জমির মালিকের সঙ্গে প্রজার চুক্তি হল একর প্রতি বৎসরে 10 কুইন্টাল ফসল খাজনা হিসাবে দিতে হবে। ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলেও খাজনা কিন্তু স্থির থাকবে। গ্রামাঞ্চলে এটি ঠিকা প্রথা নামে পরিচিত। ফসলের মধ্যমে খাজনা দেওয়ার অপর পদ্ধতিতে খাজনার পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসাবে স্থির করা হয়। যেমন জমির মালিকের সঙ্গে প্রজার চুক্তি হল উৎপাদিত ফসলের $\frac{1}{3}$ অংশ খাজনা হিসাবে দিতে হবে। এখানে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে খাজনা বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন হ্রাস পেলে খাজনা হ্রাস পাবে। গ্রামাঞ্চলে এটিই ভাগ প্রথা নামে পরিচিত।

ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত থাকলেও, যে সমস্ত অঞ্চলে কৃষিকাজে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি বেশি, সেই সমস্ত অঞ্চলে ভাগ প্রথার প্রচলন বেশি। সেইজন্যই ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভাগ প্রথার প্রচলন বেশি, কারণ এই সমস্ত অঞ্চলে সেচের প্রসার না হওয়ার জন্য কৃষিকাজ অনিশ্চিত। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলে ঠিকা প্রথার প্রচলন বেশি। সেইজন্যই পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে নতুন কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে ঠিকা প্রথার প্রচলন বেশি। কারণ এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষিকাজে অনিশ্চয়তা কম। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ভাগ প্রথা ও ঠিকা প্রথা উভয়ই চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে এবং নতুন কৃষি পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে সেই সমস্ত অঞ্চলে ঠিকা প্রথার প্রচলন বেশি। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা নেই এবং নতুন কৃষি পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেনি, সেই সমস্ত অঞ্চলে ভাগ প্রথার প্রচলনই বেশি।

● ৬.২.৩. **সমবায় চাষ ব্যবস্থা (System of Co-operative Farming) :** ভারতীয় কৃষির প্রেক্ষাপটে *জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানাকে অক্ষুণ্ণ রেখে একত্রিতভাবে চাষ করার উদ্দেশ্যে সমিতি প্রতিষ্ঠা করাকে বলা হয় সমবায় চাষ ব্যবস্থা।*

সমবায় চাষকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(ক) সমবায়িক উন্নত চাষ (Co-operative Better Farming).
(খ) সমবায়িক প্রজাভিত্তিক চাষ (Co-operative Tenant Farming).
(গ) সমবায়িক যৌথ চাষ (Co-operative Collective Farming).
(ঘ) সমবায়িক যুগ্ম চাষ (Co-operative Joint Farming).

(ক) সমবায়িক উন্নত চাষ (Co-operative Better Farming) : এই ব্যবস্থায় উন্নত প্রথায় চাষের সুবিধা লাভের জন্য কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। এই ব্যবস্থায় সদস্যগণ নিজ নিজ জমিতে একক

Scanned with CamScanner

ভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষ করে থাকে। কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার, ঋণ, কীটনাশক ঔষধ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য এই সমবায় গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একধরনের সেবা সমবায়, যার উদ্দেশ্য হল জোতের বাইরে সমবায়িক কার্যকর্মের প্রসার ঘটিয়ে কৃষির উন্নতি ঘটানো।

(খ) সমবায়িক প্রজাভিত্তিক চাষ (Co-operative Tenant Farming) ঃ এই বিশেষ ধরনের সমবায়িক চাষ ব্যবস্থায় সমবায়ের অধীন জমিগুলি ভাগ করে সমবায় সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়। ঐ জমি সমবায়ের সদস্যগণ সমবায় নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে চাষ করে থাকে এবং চাষের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমিতির কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এরা আবার সমিতিকে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেয় এবং সমিতির নির্দেশে পতিত জমি উদ্ধারে বা জমির উন্নতি সাধনের কাজে নিজেদের নিয়োগ করে। প্রকৃত অর্থে এই চাষ ব্যবস্থাকে সমবায় চাষ বলা যায় না।

(গ) সমবায়িক যৌথ চাষ (Co-operative Collective Farming) ঃ এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ভাবে জমির মালিকানা স্বীকার করা হয় না। এই ব্যবস্থায় জমিগুলি একত্রিত করে একটি বড় জোতে রূপান্তরিত করে বৃহদায়তনে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ চালানো হয়। সদস্যরা কাজের বিনিময়ে মজুরি পায়। এই পদ্ধতিতে কৃষিকাজ সফল করার জন্য কিছু কৃষকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ প্রয়োজন। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের যৌথ চাষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

(ঘ) সমবায়িক যুক্ত চাষ (Co-operative Joint Farming) ঃ জমির মালিকানা অক্ষুণ্ণ রেখে জোতগুলিকে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর একক হিসাবে একত্রে যুক্তভাবে চাষ করাকে বলে সমবায়িক যুক্ত চাষ। এখানে সমিতির সদস্যরা তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি পেয়ে থাকে। কৃষিকাজের ব্যয় বাদ দিয়ে যে নীট আয় থাকে, তা সমিতির সদস্যদের মধ্যে জমির অনুপাতে বণ্টন করা যায়। ভারতে এই ধরনের সমবায় চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

❖ ৬.২.৩.১. ভারতে সমবায় চাষের সুবিধা ও অসুবিধা ঃ ভারতে সমবায় চাষের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Advantages and Disadvantages of Co-operative Farming in India : Arguments For and Against the System of Co-operative Farming in India) ঃ ভারতে সমবায়িক যুক্ত চাষ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জমির মালিকানা অক্ষুণ্ণ রেখে ক্ষুদ্র জোতগুলিকে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর একক হিসাবে একত্রে যুগ্মভাবে চাষ করাকে বলে সমবায়িক যুক্ত চাষ। এখানে সমিতির সদস্যরা তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি পেয়ে থাকে। কৃষিকাজের ব্যয় বাদ দিয়ে যে নীট আয় থাকে, তা সমিতির সদস্যদের মধ্যে জমির অনুপাতে বণ্টন করা হয়। ভারতে এই ধরনের চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হল।

(ক) ভারতে সমবায় চাষের পক্ষে যুক্তি বা সুবিধা (Cases for or Advantages of Co-operative Farming in India) ঃ ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হয়। তার মধ্যে নীচের যুক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) কৃষি লাভজনক হবে ঃ সমবায় প্রথায় কৃষিকাজ পরিচালিত হলে জোতের আয়তন বাড়বে এবং জোতগুলি অর্থনৈতিক জোতে পরিণত হবে। ফলে ভারতের জীবন ধারণের উপযোগী কৃষি লাভজনক কৃষিতে পরিণত হবে।

(২) কৃষি উৎপাদন বাড়বে ঃ সমবায় প্রথায় জোতের একত্রিতকরণের ফলে জোতের আয়তন বাড়বে, ফলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে এবং কৃষি উৎপাদনের পরিমাণও বাড়বে।

(৩) আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়বে ঃ সমবায় প্রথায় জোতগুলি বড় হওয়ার ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কারিগরী প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ সম্ভব হবে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে রাখা সম্ভব হবে।

(৪) কৃষিজাত উদ্বৃত্ত বাড়বে ঃ সমবায় প্রথায় চাষের ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ার জন্য কৃষিতে বাড়তি পরিমাণে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে। ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান বাড়বে। দেশে কৃষিজাত উদ্বৃত্ত যত বাড়বে ততই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর হতে থাকবে।

(৫) কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ সমবায় প্রথায় চাষের ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ার জন্য সমিতিগুলি আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হবে। এই বর্ধিত আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করে গ্রামে নানা ধরনের কুটির ও

ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এই ধরনের কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করবে। ফলে গ্রামাঞ্চলে ঋতুগত বেকারত্ব, ছদ্মবেশী বেকারত্ব ইত্যাদির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

(৬) শিল্পপ্রসারে সাহায্য করবে : সমবায় প্রথায় চাষের ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং সেই সঙ্গে কৃষকের আয় বাড়বে। কৃষকের আয় বাড়ার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে যা শিল্প উন্নয়নের পথকে সুগম করবে। আবার কৃষির উৎপাদন বাড়লে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানও বাড়বে যা শিল্প প্রসারে সাহায্য করবে।

(৭) সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : সমবায় প্রসার চাষের ফলে দরিদ্র কৃষকের জীবনে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে। গ্রামাঞ্চলে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমবে এবং গ্রামীণ মহাজনদের হাত থেকে কৃষকরা মুক্তি পাবে।

(৮) গণতান্ত্রিক চেতনা বাড়বে : গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য সমবায় কৃষি সমিতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কারণ, এই সমস্ত সমিতিগুলির পরিচালনা গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

সুতরাং ভারতে সমৃদ্ধিশালী গ্রামের ভিত্তি স্থাপন ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সমবায় চাষ অপরিহার্য।

(খ) ভারতে সমবায় চাষের বিপক্ষে যুক্তি বা অসুবিধা (Cases Against or Disadvantages of Co-operative Farming in India) : ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধা থাকলেও এই সমবায় চাষ প্রবর্তনের বিপক্ষেও বেশ কিছু যুক্তি দেখানো হয়। ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয় তার মধ্যে নীচের যুক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) উৎপাদনশীলতা বিচারে অসমর্থনযোগ্য : অনেক অর্থনীতিবিদের মতে ক্ষুদ্র জোতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃহদায়তন জোত অপেক্ষা অনেক বেশি। সুতরাং তাঁদের মতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ক্ষুদ্র জোতের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সমবায় চাষ প্রবর্তনের কোনো যুক্তি নেই।

(২) কৃষকের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব : সমবায় চাষের ভিত্তি হল সাম্য, মৈত্রী ও সহযোগিতা। তাই ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পেলে সমবায়িক স্বার্থ ব্যাহত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় কৃষক ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখে। সেইজন্য সমবায় চাষে ব্যক্তি স্বার্থ সফল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় বলে সমবায় চাষে কৃষকদের উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব ঘটে।

(৩) কৃষকদের বিরোধিতা : জমির প্রতি ভারতীয় কৃষকদের আত্মিক যোগাযোগ। তাঁরা জমিকে সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসে। এটি ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের অন্তরায়। কারণ, ভারতীয় কৃষকরা মনে করে সমবায় প্রথায় চাষ হলে জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার কমে যায়।

(৪) দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মীর অভাব : সমবায় চাষ সংগঠন ও পরিচালনার জন্য দক্ষ ও সমবায় চেতনাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন। ভারতে যার খুব অভাব আছে।

(৫) বেকারত্ব বৃদ্ধি : অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, সমবায় প্রথায় চাষের অর্থ হল কৃষিকাজে আধুনিক ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার। সুতরাং কৃষিতে এই ধরনের চাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে বেকারত্ব বাড়বে।

(৬) মূলধনের অভাব : সমবায় চাষ সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের। ভারতে যার খুব অভাব আছে। কারণ ভারতের অধিকাংশ কৃষকই হল দরিদ্র। সুতরাং ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের একটা বড় বাধা হল মূলধনের অভাব।

(৭) উৎপাদিত ফসল বণ্টনের সমস্যা : সমবায় চাষে উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যের বণ্টন কিভাবে হবে তা নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়। জমির মালিকানা অনুপাতে উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্য বণ্টন করা হলে তা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কারণ জমির উর্বরতা শক্তি সকল ক্ষেত্রে সমান নয়।

(৮) রাজনৈতিক চাপ : সমবায় চাষের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি হল সমবায় চাষের সুযোগ নিয়ে শাসকগোষ্ঠীতে থাকা রাজনৈতিক দলগুলি কৃষকদের উপর অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে।

Scanned with CamScanner

ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আলোচনা করা হল, তার মধ্যে কতকগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায়, ভারতে জনসংখ্যা খুব বেশি ; কিন্তু কৃষিজ জমির পরিমাণ কম এবং উত্তরাধিকারী আইনের জন্য জোতগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের দরিদ্র চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

❖ **৬.২.৩.২. ভারতে সমবায় চাষের অগ্রগতি (Progress of Co-operative Farming in India) :** স্বাধীনতার পর ভারতে সমবায় চাষ প্রথম আরম্ভ হয় উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশে সমবায় চাষের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব সমবায় চাষ সম্পর্কে পদক্ষেপ নেয়। পরবর্তীকালে খুব ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সমবায়ের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরীক্ষামূলকভাবে স্বেচ্ছায় সমবায় পদ্ধতিতে চাষের সুপারিশ করা হয় এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনাকালে সমবায় চাষের অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয়নি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায় চাষ সম্পর্কে সরকারিভাবে লক্ষ্য ছিল 10 বৎসরের মধ্যে চাষযোগ্য জমির একটি অংশ সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে প্রায় 6 লক্ষ একর জমি ও 1 লক্ষের বেশি সদস্য নিয়ে 5,501টি সমবায় কৃষি সমিতি গঠিত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 10টি করে সমবায় কৃষি সমিতি নিয়ে এক একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে মোট 398টি পাইলট প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে দুর্বল সমবায় কৃষি সমিতিগুলিকে সক্রিয় করার লক্ষ্য স্থির করা হয় এবং যে সমস্ত অঞ্চলে উন্নতির সম্ভাবনা আছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত অঞ্চলে নতুন সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপন করার লক্ষ্য স্থির হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনাকালে সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপনের জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পঞ্চম পরিকল্পনা পর্যন্ত সমবায় চাষ ভূমি সংস্কার কার্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে ভূমি সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সমবায় চাষ। কিন্তু পরের পরিকল্পনাগুলিতে সমবায় চাষকে ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর বাইরে রাখা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমবায় চাষের ধারণা অব্যাহত আছে।

বর্তমানে ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক সমবায় কৃষি সমিতি বর্তমান আছে উত্তরপ্রদেশে, এর পরের স্থানে আছে মহারাষ্ট্র। 1980 সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে সমবায় কৃষি সমিতির সংখ্যা হল 11,000 এবং সদস্যসংখ্যা হল 3·85 লক্ষ। শতাংশের ভিত্তিতে মাত্র 2 শতাংশ চাষী সমবায় চাষে এসেছে। এই সময়ে সমবায় কৃষি সমিতির জমির পরিমাণ প্রায় 6·04 লক্ষ হেক্টর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতে সমবায় চাষের অগ্রগতি খুবই নৈরাশ্যজনক। তাছাড়া ভারতে সমবায় চাষের যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তা মূলত সরকারি সাহায্যেই ঘটেছে এবং ধনী ও বড় চাষীরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তার কারণ হল সমবায় কৃষি সমিতিগুলির পরিচালনগত ত্রুটির জন্য দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসক থাকায় সমিতিগুলির প্রতি সাধারণ সদস্যদের আস্থা নষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে 1960-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের জন্য ভূমি সংস্কারের উপর গুরুত্ব হ্রাস করে তার পরিবর্তে কৃষিতে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে উন্নত ধরনের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধু ভূমি সংস্কারের উপর গুরুত্ব হ্রাসই নয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী থেকে সমবায় চাষ ব্যবস্থাকে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং ভারতে সমবায় চাষের ব্যর্থতার কারণ কিন্তু অনেক গভীরে।

ভারতে সমবায় চাষের সুফল পেতে হলে সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবসম্মত কার্যসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত **ব্যবস্থাগুলি** গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) **সেবা সমবায় সমিতি স্থাপন :** গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে ভুল হবে। ভারতে সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল জনসাধারণের সমবায় চাষের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি ও অন্যান্য সেবা সমবায় সমিতি স্থাপন করে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে সেবা সমিতিগুলি জনসাধারণ তথা কৃষকদের বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে পারবে। এই বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

Scanned with CamScanner

(২) **শিক্ষার প্রসার :** কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমবায় চাষের জন্য যে কারিগরী দক্ষতা ও পরিচালনগত দক্ষতার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।

(৩) **মূলধন সরবরাহ ও কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা :** সমবায় সমিতিগুলি যাতে প্রয়োজনীয় মূলধন ও অন্যান্য উপাদান সঠিক সময়ে সঠিক দামে পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আবার সমবায় চাষ প্রবর্তনের ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পুনরুদ্ধার করা পতিত ও অনাবাদী জমিগুলির দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে এবং এই সমস্ত জমিতেই প্রথমে সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ধাপে ধাপে অন্যান্য জমির দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

নতুন কৃষি কৌশল : সবুজ বিপ্লব (New Agricultural Strategy :